IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের কাঠামো : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

RAGAI HEMBRAM

SPECIAL LACTURER IN DEPARTMENT OF PHILOSOPHY (SANTALI VERNACULAR), BANKURA UNIVERSITY, BANKURA, WEST BENGAL, INDIA

RESOURCE PERSON IN DEPARTMENT OF PHILOSOPHY IN SANTALI MEDIUM (OL-CHIKI SCRIPT), SADHU RAMCHAND MURMU UNIVERSITY OF JHARGRAM, JHARGRAM, WEST BENGAL, INDIA

Abstract

The *Tarkasaṅgrahaḥ* written by *Srimad Annambhaṭṭa*, is one of the most important works of Indian Logic. *Tarkasaṅgrahaḥ* is a short text book based on the Nyaya and *Vaiśeṣika* philosophy. Although it is brief, it captivates the reader with its subject matter, simplicity of the language and the style of presentation.By analyzing the word *Tarkasaṅgrahaḥ*, one can understand what topics are discussed in the book *Tarkasaṅgrahah*. In the ordinary sense the word 'Tarka' refers to objection or protest and in the Nyaya philosophy the word Tarka refers to invalid knowledge (*apramā*). Srimad *Annambhaṭṭa* neither accept the word '*Tarka'* in its ordinary sense nor as invalid knowledge (*apramā*). He meant by the word tarka seven categories accepted in Vaiśeṣika philosophy. And the word Saṃgraha means to give identity. Therefore *Tarkasaṅgrahaḥ* means the identification of the seven categories accepted in Vaiśeṣika philosophy. Now we can say that the book Tarkasaṅgrahaḥ discussed about seven categories i.e *Dravya* (Substance), *Guṇa* (Quality) *Karma*, (Action/Motion), *Sāmānya* (Generality/Univers),*Viśeṣa* (Particularity), *Samavāya* (Inherence), and *Abhāva* (Non-existence).

The discussion about the categories already done in the text *Padārtha-dharma-saṅgraha* by the *Praśastapāda* before the *Tarkasaṅgrahaḥ*. *Tarkasaṅgrahaḥ* actually represent as a pedagogical text. *Annambhatta* follows a specific structure in discussing these categories. They are respectively *uddesa*, *lakṣaṇa* and *parīkṣā*. The study highlights *Annambhaṭṭa's* use of the traditional triad of *uddesa–lakṣaṇa–parīkṣā*.

Keyword – *Tarkasaṅgrahaḥ*, categories, structure, *uddesa*, *lakṣaṇa*, *parīkṣā*

ভূমিকা

শ্রীমদ অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি উল্লেখ করেরেছেন। মঙ্গলাচারণটি হল নিম্নরূপ –

নিধায় হৃদি বিশ্বেশং বিধায় গুরুবন্দনম্।

বালানাং সুখবোধায় ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ।। ১।।[১]

এর অর্থ হল বিশ্বশকে অর্থাৎ জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে হৃদয় অর্থাৎ মনের দ্বারা ধ্যান করে এবং মাতাপিতা, গুরুজনকে প্রণাম করে বালকদের সুখবোধের জন্য তর্কসংগ্রহ গ্রন্থটি রচিত হচ্ছে। মঙ্গলাচরণে ব্যবহৃত 'তর্কসংগ্রহ' শব্দটি বিশ্লেষণ করলেই তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বোঝা যাবে। 'তর্ক' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও শ্রীমদ্ অন্নংভট্ট বৈশেষিক স্বীকৃত সাতটি পদার্থ অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবকে বোঝাতে 'তর্ক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর 'সংগ্রহ' শব্দটির অর্থ হল পরিচয় প্রদান করা। সুতরাং আমরা বলতে পারি বৈশেষিক সম্মত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব নামক পদার্থ গুলির পরিচয় প্রদানেই হল তর্কসংগ্রহ। সপ্ত পদার্থের পরিচয় পূর্বে প্রশস্থপাদের রচিত পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে দেওয়া সত্বেও অন্নংভট্ট তাঁর রচিত তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে নতুন করে পরিচয় দিচ্ছেন। কারণ মহর্ষি প্রশস্থপাদ যেমন ভাবে পদার্থের পরিচয় দিয়েছেন তা বালকদের কাছে বোধগম্য বিষয় নয়। তাই অন্নংভট্ট মঙ্গলাচরণে বলছেন বালকদের সুখবোধের জন্য তর্কসংগ্রহ গ্রন্থটি রচিত হচ্ছে। এখানে 'বালক' শব্দের দ্বারা স্তনন্ধয় শিশুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়নি, যারা আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে ও মনে রাখতে সক্ষম তাদেরকেই 'বালক' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের কাঠামো

সপ্ত পদার্থের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থাকার অন্নংভট্ট এক বিশেষ কাঠামোর অনুসরণ করেছেন। এই কাঠামোকে বলা হয় শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। পদার্থের পরিচয় প্রদানের জন্য ত্রিবিধ প্রবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল প্রথমে উদ্দেশ উল্লেখ করা, তারপর লক্ষণ দেওয়া এবং শেষে লক্ষণের পরীক্ষা করা। আমরা এখানে শাস্ত্রের এই ত্রিবিধ প্রবৃত্ত সম্পর্কেই আলোচনা করব।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থ রচয়িতা অন্নংভট্ট পদার্থ সমূহের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে তাদের উদ্দেশ উল্লেখ করেছেন। পদার্থগুলির নাম মাত্র উল্লেখ বা পদার্থের নামকীর্ত্তন করাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'উদ্দেশ' বলা হয়। যেমন অন্নংভট্ট মঙ্গলাচরণ করার পর দ্বিতীয় কারিকায় পদার্থের নামকীর্তন করেছেন। সেটি হল নিম্নরূপ –

দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ।। ২।।[২]

অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই হল সাতটি পদার্থ। এখানে যেমন পদার্থের নামকীর্তন করা হচ্ছে তেমনি একই ভাবে পদার্থের বিভাগও বলা হচ্ছে। বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্রের প্রবৃত্তি রূপে উল্লেখিত হয়নি তবে এটিও উদ্দেশর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীমদ অন্নংভট্ট পদার্থ সমূহের 'উদ্দেশ' উল্লেখ করে বা নামকীর্তন করে তিনি পদার্থগুলির লক্ষণ দিয়েছেন। লক্ষণ বলতে বোঝায় অসাধারণ ধর্মের উল্লেখ করা। যেমন দ্রব্যের লক্ষণ বলতে বোঝায় নয়টি দ্রব্যের এমন পরিচয় আবিষ্কার করা যা প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে, অথচ দ্রব্য ভিন্নে প্রযোজ্য হবে না। এমন পরিচয়কে দার্শনিক পরিভাষায় লক্ষণ বলা হয়। যেমন অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় দ্রব্যের লক্ষণ দিয়েছেন : "দ্রব্যত্বজাতিমত্ত্বং গুণবত্ত্বং বা দ্রব্যসামান্যলক্ষনম"। অর্থাৎ যাতে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে তাই দ্রব্য, অথবা যাতে গুণ থাকে তাই দ্রব্য। দ্রব্যত্বজাতিমত্ত্ব অথবা গুণবত্ত্ব দ্রব্যের সামান্য লক্ষণ।

লক্ষণের পরে অন্নংভট্ট শেষ শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি পরীক্ষার কথা বলেছেন।পরীক্ষা বলতে বোঝায় লক্ষণের দোষ বিচার করা। লক্ষণ দেওয়ার সময় অবহিত থাকতে হবে যাতে লক্ষণে কোনো প্রকার দোষ না থাকে। এটিকেই পরীক্ষা বলা হয়। এই দোষ মূলত তিনটি প্রকার, সেগুলি হল অব্যাপ্তি দোষ, অতিব্যাপ্তি দোষ ও অসম্ভব দোষ। উক্ত দোষ গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

অব্যাপ্তি দোষ : যদি লক্ষণটি লক্ষ্য পদার্থের একদেশে অর্থাৎ কোন কোন লক্ষ্য পদার্থে অবৃত্তি হলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়। যেমন যদি গরুর লক্ষণ বলা হয় 'গরু কপিলবর্ণ' তাহলে এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হবে। কারণ যেসব গরু কপিলবর্ণ নয় সেসব স্থলে (লক্ষ্যে) লক্ষণ সমন্বয় হয় না।

অতিব্যাপ্তি দোষ : যখন লক্ষণটি লক্ষ্য পদার্থ ভিন্ন অলক্ষ্যে বৃত্তি হলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যেমন 'গরু শৃঙ্গ বিশিষ্ট' এভাবে গরুর লক্ষণ দিলে ঐ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কারণ যেসব প্রাণী শৃঙ্গ বিশিষ্ট কিন্তু গরু নয়, সেসব স্থলে (অলক্ষ্যে) লক্ষণটি সমন্বয় হয়ে যাবে। তাই অতিব্যাপ্তি দোষ হবে।

অসম্ভব দোষ : যখন লক্ষণটি লক্ষ্য পদার্থ মাত্রেই অবৃত্তি হলে লক্ষণে অসম্ভব দোষ হয়। যেমন যদি গরুর লক্ষণ বলা হয় 'গরু এক খুর বিশিষ্ট' তাহলে এখানে অসম্ভব দোষ হয়। কারণ লক্ষণটি কোন গরুতেই (লক্ষ্যে) সমন্বয় হয় না।

আমরা উপরিক্ত আলোচনা থেকে তর্কসংগ্রহের কাঠামো অর্থাৎ উদ্দেশ উল্লেখ, লক্ষণ দেওয়া এবং পরীক্ষা বলতে কী বোঝায় তা জানলাম।এখানে একটি বিষয় দ্রষ্টব্য যে শ্রীমদ্ অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে পদার্থের উদ্দেশ উল্লেখ করে প্রতিটি পদার্থের লক্ষণ দিয়েছেন এবং লক্ষণের পরীক্ষা করেছেন। একই রকম ভাবে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবের বিভাগ উল্লেখ করে প্রতিটি বিভাগের লক্ষণ দিয়েছেন এবং পরীক্ষাও করেছেন। এক কথায় বলা যায় তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই অন্নংভট্ট একই কাঠামোর অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে উদ্দেশ উল্লেখ করেছেন তারপর লক্ষণ দিয়েছেন এবং পরীক্ষা অর্থাৎ দোষ বিচার করেছেন। তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের কাঠামোকে আরো ভালো ভাবে বোঝার জন্য আমরা এখানে 'বুদ্ধি' নামক গুণের আলোচনা করলাম।

বুদ্ধি বা জ্ঞান হল গুণ নামক পদার্থের একটি বিভাগ। অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বুদ্ধি সহ অন্যান্য গুণের উদ্দেশ উল্লেখ করতে বা নামকীর্ত্তন করতে গিয়ে চতুর্থ কারিকায় বলেছেন

রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথকত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বগুরুত্বদ্রবত্বস্নেহশব্দবুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছা-দ্বেষপ্রযত্নধর্মাধর্মসংস্কারাশ্চতুর্বিংশতিগুণাঃ।। ৪ ।। [৩]

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন গুণ চব্বিশ প্রকার – রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার। উক্ত কারিকাতে দেখলাম অন্নংভট্ট বুদ্ধি সহ অন্যান্য গুণের নামকীর্ত্তণ বা উদ্দেশ উল্লেখ করেছেন।

অন্নংভট্ট শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি অনুসারে বুদ্ধির উদ্দেশ উল্লেখ করে ২৭ নং কারিকায় বুদ্ধির লক্ষণ দিয়েছেন। সেটি হল

সর্বব্যবহারহেতুর্গুনো বুদ্ধির্জ্ঞানম।। ২৭ ।। [৪]

যে পদার্থটি সকল ব্যবহারের কারণ (হেতু) হয়, বুদ্ধি যার অপর নাম, সেই গুণ স্বরূপ পদার্থই জ্ঞান কিংবা জ্ঞান যার অপর নাম সেই গুণ স্বরূপ পদার্থই বুদ্ধি। এখানে অন্নংভট্ট বোধ, জ্ঞান, প্রত্যয়, প্রতীতি, মতি, সম্বিৎ, উপলব্ধি সকল শব্দই বুদ্ধির পর্য্যায় শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কোন পদার্থের ব্যবহার তখনেই সম্ভব যখন ব্যবহারকারীর ও পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান থাকে। অর্থাৎ সকল প্রকার ব্যবহারেই বুদ্ধি বা

জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। আর সর্ববিধ ব্যবহার বলতে এখানে গ্রহণ, বর্জন, উপেক্ষা, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

অন্নংভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়ার পর সেই লক্ষণের পরীক্ষা বা দোষ বিচার করেছেন। তিনি তাঁর দীপিকাটীকায় বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে প্রদত্ত 'গুণ', 'সর্বব্যবহারহেতু' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণের পরীক্ষা বা দোষ বিচার করেছেন। নিম্নে 'গুন', 'সর্বব্যবহারহেতু' প্রভৃতি শব্দ বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে কি প্রয়োজন তা আলোচনা করা হল।

বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে 'গুণ' শব্দটি না থাকলে অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষণ যদি "সর্বব্যবহারহেতুঃ জ্ঞানম" এরকম হত তাহলে কাল, দিক প্রভৃতিতে জ্ঞানের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যেত। অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হত, কেননা কাল, দিক প্রভৃতি সকল ব্যবহারের প্রতি কারণ (হেতু) হয়। কিন্তু জ্ঞানের লক্ষণে 'গুণ' শব্দটি দিলে কাল, দিক ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হবে না কেননা কাল, দিক প্রভৃতি সকল ব্যবহারের কারণ (হেতু) হলেও গুণ নয়। কিন্তু জ্ঞান হল গুণ স্বরূপ পদার্থ। তাই অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাটীকায় বলেছেন "কালাদৌ অতিব্যাপ্তি বারণায় গুণ ইতি" [৫] অর্থাৎ কাল ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'গুণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে 'সর্বব্যবহার হেতু' শব্দগুচ্ছ না থাকলে অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষণ যদি "গুণঃ জ্ঞানম" গুণই হল জ্ঞান এরকম হত তাহলে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ পদার্থে জ্ঞানের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যেত। অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হত, কেননা রূপ রস, গন্ধ প্রভৃতিও গুণ পদার্থ। কিন্তু জ্ঞানের লক্ষণে 'সর্বব্যবহার হেতু' শব্দগুচ্ছ দিলে রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হবে না, কেননা রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ হলেও সর্বব্যবহারের হেতু (কারণ) নয়। কিন্তু বুদ্ধি হল সর্বব্যবহারের হেতু। তাই অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাটীকায় বলেছেন "রূপাদৌ অতিব্যাপ্তি বারণায় সর্বব্যবহার ইতি" [৬] অর্থাৎ রূপ ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'সর্বব্যবহার হেতু' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্নংভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ পরীক্ষা করতে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থ নিজের দেওয়া লক্ষণকেই যথার্থ বলছেন না। তিনি বলছেন "সর্বব্যবহারহেতুর্গুণো" বুদ্ধির এইরূপ লক্ষণ হলে নির্বিকল্পক জ্ঞানে এই লক্ষণটি সমন্বয় হবে না। অর্থাৎ জ্ঞানের এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হচ্ছে, কেননা ন্যায়মতে নির্বিকল্পক জ্ঞান একপ্রকার জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যবহারের প্রতি কারণ (হেতু) হয় না। তাই বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ থেকেই যাচ্ছে। এর সমাধান কল্পে অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় জ্ঞানের নতুন লক্ষণ দিয়েছেন – "জ্ঞানত্বমেব লক্ষণম" [৭] অর্থাৎ জ্ঞানত্বই জ্ঞানের লক্ষণ। যা জ্ঞানত্ব জাতির আশ্রয় তাকেই জ্ঞান বলে। তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে জ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে "বুদ্ধিঃ জ্ঞানম" এখানে অন্নংভট্ট জ্ঞান শব্দের দ্বারা জ্ঞানত্ব জাতিকেই বুঝিয়েছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে বৈশেষিক স্বীকৃত সাতটি পদার্থর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে যে কাঠামোর অনুসরণ করলেন তা হল, প্রথমে উদ্দেশ উল্লেখ বা নামকীর্ত্তণ করা, তারপর লক্ষণ দেওয়া এবং শেষে সেই লক্ষণের পরীক্ষা করা বা দোষ বিচার করা। এই কাঠামো অনুসরণ করেই অন্নংভট্ট প্রতিটি পদার্থ এবং সেই পদার্থের বিভাগ গুলিও আলোচনা করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র। শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ (সটীকঃ) অধ্যাপনাসহিতঃ। সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার, আশ্বিন-১৪১০, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃষ্ঠা- ১

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৪

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬০

৫. বাগচী, দীপক কুমার। অন্নংভট্ট বিরচিত তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, ২০০৮, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ৬৩

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৩

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৪